এসো ঈমান শিখি

ঈমান গ্রহন করতে হলে বা ঈমান ধরে রখতে হলে যা জানতেই হবে

মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে অগনিত শুকরিয়া যিনি আমাকে ও আমার মত কোটি কোটি বনি আদমকে বিনা দরখাস্তে মুসলমানের ঘরে জন্ম দিয়ে জন্ম সূত্রেই মুসলিম বানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের বিষয় বিনা দরখাস্তে এবং বিনাশ্রমে এতবড় নিয়ামত পেয়েও পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলিম আজ তা ধরে রাখতে পারছে না । আর এর মূল কারণ হচ্ছে ঈমান কি এবং ঈমান ভঙ্গের কারণগুলো কি কি সে সম্পর্কে আমাদের সীমাহীন অজ্ঞতা এবং অবহেলা । আমরা চাকরি, ব্যবসা, কৃষিকাজ বা আমাদের নিজ নিজ পেশাসহ দুনিয়াবী বিষয়ে যতটা সিরিয়াস; আখেরাতের বিষয়ে ঠিক ততটাই কেয়ারলেস ! যদি সত্যিকার অর্থে আখেরাতের ভয়াবহতার উপলব্ধি আমাদের মধ্যে থাকত তাহলে ঈমান এবং ঈমান ভঙ্গের ব্যাপারে আমরা এত কেয়ারলেস থাকতে পারতাম না । হুজুর আকরাম (সাঃ) ১৪০০ বছর আগেই আমাদেরকে শেষ যামানার ঈমান বিধ্বংসী ফিতনার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে গেছেন।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "মানুষের উপর এমন একটি যুগের আগমন ঘটবে যখন তার পক্ষে ঈমান ধারণ করে থাকাটা জ্বলন্ত অঙ্গার মুষ্টিবদ্ধ করে রাখা ব্যক্তির মতো কঠিন হবে ।" (তিরমিজি-২২৬০)

ইয়াহইয়া ইবনু আইউব, কুতায়বা ও ইবনু হুজর (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ " অন্ধকার রাতের মত ফিতনা আসার আগেই তোমরা নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হও। সে সময় সকালে একজন মুমিন হলে বিকালে কাফির হয়ে যাবে। বিকালে মুমিন হলে সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার দ্বীন বিক্রি করে বসবে ।" (সহিহ মুসলিম ২১৪)

হযরত উমাইর বিন হানি (রাঃ) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, একদা আমরা নবী কারীম (সা:) এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। নবী (সা:) মানুষদেরকে ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করছিলেন । ফিতনার বিস্তারিত বিশ্লেষন করতে করতে এক পর্যায়ে ফিতনায়ে আলাছ সম্পর্কে বললেন। কেহ জিজ্ঞেস করল ফিতনায়ে আহলাছ কি ? উত্তরে তিনি (সাঃ) বলেন সেটা হচ্ছে মানুষের পলায়ন এবং ঘর বাড়ি ও মাল সম্পদ লুট-পাটের ফিতনা । এরপর হচ্ছে স্বচ্ছলতা ও বিলাসিতার ফিতনা এরপর বজ্রপাত এমন এক ব্যক্তির পদনিচ থেকে হবে যে মনে করবে সে আমার আহলে বায়াত । কিন্তু সে আমার অধীনস্ত না । আমার অধীনস্ত হল খোদাভীরুগন । এরপর মানুষ অযোগ্যকে প্রধান হিসাবে মেনে নিবে। এরপর হচ্ছে অন্ধকারের ফিতনা । তার থেকে কেহই বাঁচতে পারবে না । ঐ ফিতনার সময় মানুষ সকালে মুসলমান হবে বিকালে কাফের হবে। শেষপর্যন্ত মানুষ দুই দলে বিভক্ত হবে (১)মুমিনের দল যার মধ্যে বিন্দু মাত্র কপটতা থাকবে না । (২) মুনাফিকের দল যার মধ্যে বিন্দু মাত্র

ইমান থাকবে না । যখন এই পরিস্থিতি হবে তখন তোমরা দাজ্জালের অপেক্ষা কর ঐ দিন বা তার পরের দিন । (মুসনাদে আহমদ)

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে দেখা যাচ্ছে যে শেষ যামানায় মূলত মানুষের ঈমানের উপর হামলা আসবে । যে কারণে কেউ সকালে মুমিন হয়ে বের হয়েও বিকালে কাফের হয়ে ঘরে ফিরবে । কাজেই মুসলমান হতে হলে এবং পরবর্তীতে মৃত্যু পর্যন্ত ঈমান ধরে রাখতে হলে আমাদেরকে প্রথমেই জানতে হবে **ঈমান কি ?** আর ঈমান কি তা জানতে হলে প্রথমেই জানতে হবে **ইলাহ** এবং **ইবাদত** মানে কি ? কারণ কেউ যদি ঈমান গ্রহন করতে চায় তাহলে প্রথমেই তাকে **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর** সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে । আর **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর** সাক্ষ্য প্রদান করতে হলে **ইলাহ** এর অর্থ, সংজ্ঞা বা প্রকৃতি বুঝতে হবে এবং **ইলাহ** এর অর্থ, সংজ্ঞা বা প্রকৃতি বুঝতে হলে **ইবাদতের** অর্থ, সংজ্ঞা বা প্রকৃতিও বুঝতে হবে পাশাপাশি **তাগুত** কি তাও জানতে হবে । এ বিষয়গুলো আলোচনার পূর্বে আর একটি বিষয়ের আলোচনা এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক মনে করছি আর তা হচ্ছে -

সকল প্রকার ন্যায়-অন্যায়, করনীয়-বর্জনীয়, বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারাম এর নির্ধারক /নির্ণায়ক/ উৎস কে ?

পৃথিবীর সকল দেশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের মানুষের ন্যায়-অন্যায়, করনীয়-বর্জনীয়, বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারাম এর দৃষ্টিভঙ্গী/মানদণ্ড এক নয় । যেমন ধরুন – ইউরোপ বা আমেরিকায় মদ, সুদ, জিনা, জুয়া, সমকামিতা, নারী-পুরুষের ফ্রি মিক্সিং বা অবাধ মেলামেশা বৈধ । কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলোতে আইনগতভাবে তা অবৈধ । আবার বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া সহ অনেক দেশেই মদ, সুদ, জিনা, জুয়া, নারী-পুরুষের ফ্রি মিক্সিং বৈধ কিন্তু সমকামিতা অবৈধ । এর কারণ হচ্ছে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রেই ন্যায়-অন্যায়, করনীয়-বর্জনীয়, বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারাম এর নির্ধারক /নির্ণায়ক হচ্ছে তাদের **আইনসভা বা পার্লামেন্ট** । অর্থাৎ **রাষ্ট্রের জনগণই ঠিক করে কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায় বা কোনটা বৈধ আর কোনটা অবৈধ।** ফলে দেখা যায় এক দেশে যেটা বৈধ আরেক দেশে সেটা অবৈধ।

কিন্তু যদি কেউ মুসলমান হতে চায় বা মুসলমান থাকতে চায় তবে তাকে অবশ্যই এটা মানতে হবে যে সকল প্রকার ন্যায়-অন্যায়, করনীয়-বর্জনীয়, বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারাম এর একমাত্র নির্ধারক /নির্ণায়ক/উৎস হচ্ছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বা আরো সহজভাবে বলতে গেলে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত শরীয়াহ (কুরআন-হাদিস-ইজমা-কিয়াস)। কারণ মুসলমান মাত্রই বাধ্যতামূলকভাবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হুকুম/আদেশ/আইন/বিধানের অধীন । এক মুহূর্তের জন্যও সে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হুকুম/আদেশ/আইন/বিধান থেকে স্বাধীন নয় । তাই ন্যায়-অন্যায়, করনীয়-বর্জনীয়, বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারাম নির্ধারণে মানুষের বা সৃষ্টি জগতের কোন হাত নেই। এই ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের । এখানে কোন প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান বা যুক্তি-তর্কের কোন সুযোগ নেই । মালিকের (আল্লাহ তাআলা) কথাই হচ্ছে আইন । এই আইনের বিরুদ্ধে গোলামের 'কেন?' বলার কোন সুযোগ নেই । মালিকের হুকুম/আদেশ/নিষেধ/আইন/

বিধান/সিদ্ধান্তের বিপরীতে 'কেন?' প্রশ্ন/চ্যালেঞ্জ ছুড়লেই ইসলাম থেকে খারিজ । ইবলিশ তার বড় উদাহরণ । আমরা অনেকেই মনে করি ইবলিশ আল্লাহ তাআলার একটা হুকুম/আদেশ/আইন/বিধান অমান্য করার কারণে চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত হয়েছে । তাহলে সহজেই প্রশ্ন জাগে আমরা যে আল্লাহ তাআলার অসংখ্য হুকুম/আদেশ/বিধান প্রতিনিয়ত অমান্য করছি তাহলে আমরাও কি ইবলিশের মত চির অভিশপ্ত ? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আগে আমাদেরকে অমান্যতার সংজ্ঞাটা পরিস্কার করতে হবে । সাধারণত অমান্যতা/অবাধ্যতা বলতে পালন/পরিপালন না করাকে বুঝায় । কিন্তু অমান্যতা/অবাধ্যতার আরেকটা দিক আছে । সেটা হল অস্বীকার বা অস্বীকারমূলক অমান্যতা/অবাধ্যতা বা চ্যালেঞ্জ সহকারে অমান্যতা/অবাধ্যতা । মুসলমান দাবীদারদের মধ্যে যে বা যারা শয়তানের ধোকায় পড়ে বা নফসের ধোকায় পড়ে মহান রবের হুকুম/আদেশ/আইন/বিধান অমান্য করে কিন্তু রবের সংশ্লিষ্ট হুকুম/আদেশ/আইন/বিধান অস্বীকার বা চ্যালেঞ্জ করে না বরং গুনাহকে গুনাহ মনে করেই করে তাহলে তা হবে পালন/পরিপালন না করা সংক্রান্ত অমান্যতা বা অবাধ্যতা । এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ মহান রবের ক্ষমতা বা বান্দার উপর তাঁর অধিকারকে অস্বীকার করেনা বা অস্বীকারমূলক অবাধ্যতা প্রদর্শন করেনা বা মহান রবের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেনা। অর্থাৎ আকিদাগতভাবে সে/তারা আল্লাহ তাআলার ক্ষমতাকে স্বীকার করে কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে অবহেলা বা অসতর্কতা বা শয়তানের ধোকা বা নফসের ধোকাহেতু পালন করে না । একারণে সে/তারা কঠিন গুনাহগার হয় সত্যি কিন্তু ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায়না । যা তাকে/তাদেরকে চির অভিশপ্ততা থেকে বাঁচায় ।

অন্যদিকে মুসলমান দাবীদারদের মধ্যে যে বা যারা মহান রবের হুকুম/আদেশ/আইন/বিধান অস্বীকার করে বা অস্বীকারমূলক অবাধ্যতা প্রদর্শন করে বা মহান রবের হুকুম/আদেশ/আইন/বিধান কে চ্যালেঞ্জ করে অমান্য করে সেটা হয় ইবলিশের মত অবাধ্যতা/অমান্যতা । যা তাকে/তাদেরকে ইবলিশের মত ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে দেয় ।

এখন উপরের আলোচনা থেকে আর একটিপ্রশ্ন জাগে আর তা হচ্ছে-স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে জীবনের কোন একটি বিষয়ের ক্ষেত্রেও যদি কোন মুসলমান দাবীদার কুরআন-সুন্নাহর মোকাবেলায় বা কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে তদস্থলে অন্যকোন মানদন্ডকে তথা দলের সিদ্ধান্তকে, মতকে, নেতা-নেত্রী /প্রতিষ্ঠান (দেওবন্দ, নিজামুদ্দিন, মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি)/তরিকা (চিশতীয়া, কাদেরিয়া, নকশেবন্দিয়া ইত্যাদি)/ফিরকা (আহলে হাদিস, সুন্নী জামাত ইত্যাদি)/ দর্শন (মওদূদীবাদ,সুফীবাদ ইত্যাদি)/ স্কলার / আকাবির/পীর/বুজুর্গ/শাইখ বা নিজেদের রচিত কোন আইন বা বিধানকে অনুসরন করে বা প্রাধান্য দেয় তবে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ঈমান থাকবে কি ?

উত্তর হচ্ছে –"না"।

কারণ যেহেতু সকল প্রকার ন্যায়-অন্যায়, করনীয়-বর্জনীয়, বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারাম এর একমাত্র নির্ধারক /নির্ণায়ক হচ্ছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত শরীয়াহ (কুরআন-হাদিস-ইজমা-

কিয়াস); সেহেতু এস্থলে অন্য যেকারো বিধান/আইন/মত/সিদ্ধান্তকে গ্রহন বা প্রাধান্য দেওয়ার মানে হচ্ছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কর্তৃক প্রদত্ত শরীয়াহকে চ্যালেঞ্জ করা বা অস্বীকার করা।

যাইহোক আসুন মূল আলোচনায় ফিরে আসি ।

ইলাহ এবং ইবাদত এর অর্থঃ

ইলাহ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে মাবুদ, উপাস্য, প্রভু । আর ইবাদত এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে উপাসনা বা আরাধনা।

কিন্তু পারিভাষিক অর্থে **ইলাহ** বলতে বুঝায় এমন সত্ত্বাকে যার **ইবাদত** করা হয় অর্থাৎ মানুষ/জিন যার ইবাদত করে । পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত থেকেই আমাদের সামনে এই বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে । আল্লাহ তাআলা বলেন, " **তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারিয়ামের পুত্র মাসীহকেও, অথচ তাদের প্রতি শুধু এই আদেশ করা হয়েছিল যে তারা শুধু এক মা'বুদের ইবাদত করবে যিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র "-(১ সূরা তাওবা: ৩১)।**

উপরোক্ত আয়াতটি থেকে স্বাভাবিকভাবে একটি ব্যাপার বুঝে আসে না - তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে।' অর্থাৎ **আল্লাহ তাআলা বলছেন মানুষ মানুষকে** (পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদেরকে) **তাদের প্রভু (ইলাহ) বানিয়ে নিয়েছে** ! নিম্নের হাদিস থেকেই বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ ।

হাদীস শরীফে এসেছে ইমাম বুখারী রহ. বর্ণনা করেন:

আদী ইবনে হাতেম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি গলায় একটি ক্রুশ ঝুলন্ত অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকট এলে তিনি বলেন, হে আদী এই র্মূতিটি তুমি তোমার গলা থেকে ছুঁড়ে ফেল। ফলে আমি তা খুলে ফেললাম, অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকট এসে দেখতে পেলাম, তিনি সূরা তাওবা তিলাওয়াত করছেন: "তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও র্ধম-যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে । আমি বললাম, আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না । রসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, আল্লাহ তায়ালা যা হালাল করেছেন তারা তা হারাম করতো আর তোমরাও তা হারাম মানতে এবং আল্লাহ তায়ালা যা হারাম করেছেন তারা তা হালাল করতো আর তোমরাও তাকে হালাল ভাবতে । আমি বললাম, হ্যাঁ এমনটিই । তিনি (সা:) বললনে, **এটিই তাদের ইবাদত ।** [তারিখুল কাবীর লিল ইমাম বুখারী ৭ম খন্ড ৪৭১ নং হাদীস; সুনানে তিরমিযি: ৩০৯৫; মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী: ১৭/৯২/২১৮,২১৯; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী: ২০৩৫০ (সনদ: হাসান সহীহ)

অন্য হাদীসে রাসূল সা. বলেন, **'স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না ।'**- তিরমিযি

তাহলে এখানে হুজুর আকরাম (সাঃ) এর হাদীস থেকে আমরা বুঝলাম **কারো হুকুম/আদেশ/আইন/বিধান মানার নামই হচ্ছে ইবাদত** । আর **যার হুকুম/আদেশ/আইন/বিধান মান্য করা হয় সেই হচ্ছে ইলাহ বা প্রভু** । ফলে তৎকালীন নাসারারা (খ্রিস্টান) আল্লাহ তাআলার বিধান বাদ দিয়ে বা বিধানের মোকাবেলায় তাদের পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদের হুকুম/আদেশ/আইন/বিধান মান্য করার কারণে আল্লাহ তাআলা বলেছেন - "তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে।"

এখানে আর একটি বিষয় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । তা হচ্ছে – আল্লাহ তাআলা কিন্তু এখানে এটা বলেননি যে তাদের পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকরা প্রভু হয়ে গিয়েছে । মানে নিজেরা হয়ে গিয়েছে । বরং আল্লাহ তা'আলা বলছেন তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে । তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে **মূল/প্রধান অপরাধী বা ১ নম্বর আসামী হচ্ছে যারা প্রভু বানিয়েছে** অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার বিধান বাদ দিয়ে বা বিধানের মোকাবেলায় পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদের হুকুম/আদেশ/আইন/বিধান মান্য করেছে তারা । যদিও এখানে পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকরা আসামী/অপরাধী । কিন্তু তারা মূল/প্রধান আসামী/অপরাধী নয় । কারণ তারা আল্লাহ তা'আলার বিধান বাদ দিয়ে বা বিধানের মোকাবেলায় তাদের হুকুম/আদেশ/আইন/বিধান মান্য করার ক্ষেত্রে কাউকে বাধ্য করেনি বা বাধ্য করার ক্ষমতাও তাদের ছিল না । বরং তাদের অনুসারীরা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এবং একান্ত অনুগত হয়ে তাদের হুকুম/আদেশ/আইন/বিধান মান্য করেছে ।

এখন উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে আসুন আমরা নিজেদের অবস্থানটা একটু যাচাই করি ।

আল্লাহ তাআলা বলেন, " **সৃষ্টি তাঁর বিধানও তাঁর** " - **(সুরা আরাফ ৫৪)** ।
অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, " **বিধান দেওয়ার ক্ষামতা একমাত্র আল্লাহর** " -**(সুরা ইউসুফ ৪০)** ।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, " **নিশ্চই শয়তানরা তাদের বন্ধুদের নিকট ওহী প্রেরণ করে যাতে তারা তোমাদের সাথে বির্তক করে । আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, নিশ্চিত তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে ।" [সূরা আনআম: ১২১]**

ইবনে কাসীর (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :
আল্লাহ তায়ালার বাণী - 'যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর আদেশ ও শরীয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য কারো কথার দিকে দৃষ্টি দাও এবং সেটিকেই প্রাধান্য দাও তাহলে সেটিই হবে শরিক। [তাফসীরে ইবনে কাছীর, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:৩২৯]
অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন " আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবী করে যে যা আপনার প্রতি অর্বতীণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অর্বতীণ হয়েছে তার উপর তারা ঈমান এনেছে ইহা সত্ত্বেও তারা তাগূতের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা পোষণ করছে । অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যাতে তারা তাকে (তাগূতকে) অস্বীকার করে । পক্ষান্তরে শয়তান ইচ্ছা করছে তাদেরকে পরিপূর্ণ পথভ্রষ্ট করে ফেলতে ।" [সূরা-নসিা, আয়াত:৬০]

এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন ব্যক্তির দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে যে দাবী করে আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলের উপর ও পূর্ববর্তী আম্বিয়াদের উপর যা অর্বতীণ করেছেন সে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে অথচ সে বিবদমান বিষয়াদিতে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহকে ছেড়ে ভিন্ন কোন কিছুর কাছে বিচার ফায়সালা চায় ।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, " তাদের জন্য এমন কিছু শরীক আছে কি যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। " [সুরা আশ শুরা: ২১]

" তারা কি জাহিলিয়্যাতের বিধি-বিধান কামনা করে ? বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর বিধানদানকারী ?" [সূরা মায়দাহ: ৫০]

সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেন: এই নসের মাধ্যমে **জাহিলিয়্যাতের** র্অথ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বর্ণনা ও তাঁর কুরআনের সংজ্ঞা অনুযায়ী **জাহিলিয়্যাত** বলা হয়, **মানুষের জন্য তৈরী মানুষের বিধানকে** । কেননা এটা মানুষ র্কতৃক মানুষের দাসত্ব, আল্লাহ তা'আলার দাসত্বকে র্বজন । তাঁর **উলুহিয়্যাতকে** প্রত্যখ্যান এবং প্রত্যাখ্যানের পর তার মোকাবেলায় কতক মানুষের **উলুহিয়্যাতকে** গ্রহণ । আল্লাহ তায়ালার পরিবর্তে তাদের দাসত্বের সামনে আত্মসর্মপণ ।

এই নসের আলোকে বোঝা যায় **জাহিলিয়্যাত** কোন এক সময়ের নাম নয় । **জাহিলিয়্যাত** হলো, এক ধরনের উদ্ভাবন ও প্রণয়নের নাম । যা বর্তমানে বিদ্যমান আছে, ভবিষ্যতেও বিদ্যমান থাকবে । যা আসে ইসলামের মোকাবেলায়, যার সাথে থাকে ইসলামের বৈপরীত্য । [ফী-যলিাললি কুরআন, খন্ড:২, পৃষ্ঠা:৩৮৪]

তাহলে উপরোক্ত দলিল সমূহের (এছাড়াও এ বিষয়ে আরও অনেক দলিল/আয়াত/হাদিস রয়েছে নিবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সেগুলো উল্লেখ করা হতে বিরত থাকছি) আলোকে এটা সুস্পষ্ট যে **আইন/বিধান/সংবিধান প্রণয়নের কোন ক্ষমতা মানুষের নেই** । মানুষ দুনিয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিধান/আইন/সংবিধান বাস্তবায়ন/বলবত করবে এই অর্থে তারা দুনিয়াতে **আল্লাহর খলিফা** । কিছু উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিস্কার হয়ে যাবে । আমাদের দেশের কথাই ধরুন । রাষ্ট্রের বিধান মোতাবেক একটি জেলার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হছেন জেলা প্রশাসক । কিন্তু জেলা প্রশাসক কি কোন আইন/বিধান প্রণয়ন করতে পারেন ? নাকি রাষ্ট্র/সরকার/আইনসভা/পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণয়নকৃত আইন/বিধান প্রয়োগ/বাস্তবায়ন/বলবত করেন ? আবার জেলার প্রধান বিচারক হচ্ছেন জেলা জজ । তিনি কি কোন আইন/বিধান প্রণয়ন করতে পারেন? নাকি রাষ্ট্র/সরকার/আইনসভা/পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণয়নকৃত আইন/বিধান/দন্ডবিধি/ কার্যবিধি অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা করেন ? এ বিষয়টি সকল প্রশাসনিক বিভাগ/কর্মকর্তা/ কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য । কারণ দেশের সংবিধান মোতাবেক সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র মালিক হচ্ছে রাষ্ট্র (নাউযুবিল্লাহ) । তাই কেবল রাষ্ট্রই আইন/সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা রাখে । অন্য কেউ নয় । এমনকি রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান বিচারপতিরও আইন/সংবিধান প্রণয়নের কোন ক্ষমতা নেই । রাষ্ট্র তার এই ক্ষমতা আইনবিভাগ/আইনসভা/পার্লামেন্ট এর কাছে শর্ত সাপেক্ষে অর্পণ করে রেখেছে । শর্ত হচ্ছে সংবিধান হবে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন । আইন বিভাগ/আইনসভা/পার্লামেন্ট যেকোন আইন প্রণয়ন করতে পারবে । কিন্তু তা হতে হবে সংবিধানের সাথে

সংগতিপূর্ণ । সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বা অসংগতিপূর্ণ কোন আইন/বিধান পার্লামেন্ট প্রণয়ন করতে পারবে না । যদি করে তবে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বা অসংগতিপূর্ণ সংশ্লিষ্ট আইন/বিধান বা সংবিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট আইন/বিধানের অসংগতিপূর্ণ অংশ বাতিল বলে গন্য হবে । এমনকি সংবিধানের কোন সংশোধনী বা সংশোধনীর অংশ বিশেষও যদি সংবিধানের মূল চরিত্রের সাথে সাংঘর্ষিক বা অসংগতিপূর্ণ হয় তবে তাও বাতিল বলে গন্য হবে ।

এক্ষনে আমি সচেতন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই – **সার্বভৌমত্ব একমাত্র মহান রবের জন্য নির্দিষ্ট** । সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ । অন্য কেউ নয় । সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের দাবী অবশ্যই মিথ্যা এবং নকল । এখন সার্বভৌমত্বের এই মিথ্যা দাবীদার রাষ্ট্রই যদি তার আইন/সংবিধান/বিধান প্রণয়নের মিথ্যা ক্ষমতায় কাউকে শরিক করতে না দেয় তাহলে আমরা কি করে ভাবতে পারি সার্বভৌমত্বের প্রকৃত মালিক মহান রাব্বুল আ'লামিন এই ক্ষমতা মানুষকে দিয়ে দিবেন বা দিয়েছেন ? যদিও এই যুক্তি ছাড়াই পবিত্র কুরআন-হাদীসের দলিল (যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) থেকে এটা সুস্পষ্ট যে আইন/সংবিধান প্রণয়নের একমাত্র ক্ষমতা আল্লাহর এবং মানুষ কেবল দুনিয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিধান/আইন/সংবিধান বাস্তবায়ন/বলবত করবে এই অর্থে তারা দুনিয়াতে **আল্লাহর খলিফা** ।

ফলে চার মাযহাবের সকল ইমামগণ এবং ফকিহগণসহ পৃথিবীর সকল উলামাগণ/ফকিহগণ কুরআন-হাদীসের অকাট্য দলিল মোতাবেক এ বিষয়ে একমত যে রাষ্ট্রীয় সংবিধান থেকে আল্লাহর বিধানকে রহিত করে মানব রচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা কুফর ও রিদ্দাহ। এখন দেখুনতো প্রিয় পাঠক বাংলাদেশ তো অবশ্যই পৃথিবীর যেসকল রাষ্ট্রগুলোকে আমরা মুসলিম রাষ্ট্র (মুসলিম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত হওয়ার কারণে) হিসাবে বিবেচনা করি সেই ৫৭ টি মুসলিম রাষ্ট্রের একটিতেও (মুজাহিদিনের নিয়ন্ত্রনে থাকা খোরাসান ও আফ্রিকার কিছু ভূমি ও নামকাওয়াস্তে কুরআনিক কিন্তু বাস্তবে রাজতন্ত্রিক সৌদি আরব বাদে) কুরআন কি সংবিধান নাকি মানব রচিত আইন সংবিধান ? এই অবস্থায় আমরা যারা মুসলিম দাবীদার তারা কি এসকল মানব রচিত সংবিধানের আনুগত্য করছি নাকি কুরআনের ? আর এই আনুগত্য কি বাধ্য হয়ে করছি না কি একান্ত অনুগত হয়ে ? যারা অনুগত হয়ে কুরআন বাদ দিয়ে মানব রচিত সংবিধান মান্য করছি তাদের ঈমানী হালাত কি ? **তারা কি শিরক, কুফর এবং রিদ্দাহয় লিপ্ত নই** ? আর যারা মনে করছি যে আমরা তো বাধ্য হয়ে মানছি তারা কি মানব রচিত সংবিধানকে উৎখাত করে আল্লাহর কুরআনকে সংবিধান হিসাবে পুনঃস্থাপনের জন্য কোন ভূমিকা পালন করছি ? যদি না করি তাহলে আমাদের অবস্থা কি মক্কার তৎকালীন সেই মুসলমানদের মত হবে না যাদের ব্যপারে হাদীস শরীফে এসেছে –

ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

মক্কায় কিছু ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যারা ইসলামকে গোপন করে রাখতো । বদর যুদ্ধের দিন মুশরিকরা তাদেরকে নিজেদের সাথে বের হতে বাধ্য করলো । ফলে তারা কতক কতকের দ্বারা আক্রান্ত হলো (নিহত হলো)।

মুসলমানরা বলতে লাগল, আমাদের এই সাথীরা তো মুসলমান ছিল কিন্তু তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে । সুতরাং তোমরা তাদের জন্য ইস্তেগফার কর । তখন অবতীর্ণ হলো:

নিশ্চয়ই নিজেদের প্রতি জুলুম করা অবস্থায় ফেরেশতাগণ যাদের জান কবজ করলেন, তখন ফেরেশতাগণ (তাদেরকে) বললেন, 'তোমরা কি অবস্থায় ছিলে' ? তারা বলল 'আমরা যমীনে দুর্বল ছিলাম'। ফেরেশতাগণ বললেন, 'আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে তোমরা তাতে হিজরত করতে ?' সুতরাং ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল হলো জাহান্নাম । আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল । [সূরানিসা:৯৭] [তাফসীরুত তবারী, হাদীস নং:১০২৫৯, খন্ড:৯, পৃষ্ঠা:১০২]

উপরোক্ত ব্যক্তিদের অপরাধ হলো তারা মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেনি । অন্যথায় বদর যুদ্ধে তারা তো স্বেচ্ছায় আসেনি বরং তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল । আর তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রও পরিচালনা করেনি ।

তাহলে এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, যে বা যারা স্বেচ্ছায় আল্লাহকে বাদ দিয়ে বা আল্লাহ প্রদত্ত সংবিধান/বিধানের মোকাবেলায় অনুগত হয়ে মানব রচিত সংবিধান/বিধান মানছে তারা তো সরাসরি আল্লাহর পরিবর্তে মানুষকে প্রভু বানিয়েই নিয়েছে ।

আর যারা দাবী করছে বাধ্য হয়ে মানব রচিত সংবিধান/বিধান মানছে কিন্তু আল্লাহর জমিন থেকে মানব রচিত সংবিধান/বিধান/আইন বিতাড়িত করে আল্লাহর আইন/সংবিধান/বিধান কায়েমের ব্যাপারে নববী পন্থায় কোনরূপ ভূমিকা পালন করছে না বা সুন্নাহ সমর্থিত/সম্মত পন্থা বাদ দিয়ে কুফরী গণতান্ত্রিক পন্থায় বা অন্য কোন সুন্নাহ বিবর্জিত পন্থায় ভূমিকা পালন করার দাবী করছে তাদের ঈমানী হালাত কি হবে বা হতে পারে তা কাফেরদের চাপে বাধ্য হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে উলটো মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েও মক্কার ঐ মুসলমানদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সিদ্ধান্তটা (সূরা নিসা-৯৭) দেখে নেয়াই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি ।

এতো গেল রাষ্ট্রীয় সংবিধান থেকে আল্লাহর বিধানকে রহিত করে মানব রচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা শিরক, কুফর ও রিদ্দাহর বিষয় । কিন্তু তথাকথিত এসব মুসলিম রাষ্ট্র বা এসব রাষ্ট্রের মুসলিম দাবীদার শাসকগোষ্ঠী কি এতটুকু করেই ক্ষান্ত আছে ? উত্তর হচ্ছে- "না" ।

বরং তারা রাষ্ট্রীয় সংবিধান থেকে আল্লাহর বিধানকে রহিত করে মানব রচিত সংবিধান **তো প্রবর্তন করেছেই উপরন্তু তারা মহান রাব্বুল আ'লামিনকে চ্যালেঞ্জ করে তাদের সংবিধানে** আল্লাহ তা'**আ**লা যা হালাল **করেছেন** তারা তা হারাম **করেছে** এবং আল্লাহ তা'**আ**লা যা হারাম **করেছেন** তারা তা হালাল কর**ছে** । যেমন ধরেন – মদ, সুদ, জুয়া, জিনা, গাইরে মাহরামের সাথে সহশিক্ষা বা অন্য যেকোন সহাবস্থান (হোক তা চাকরী ক্ষেত্রে বা অন্য যেকোন ক্ষেত্রে) বা পর্দার খেলাফ বিষয়াবলী ইত্যাদি আল্লাহ তা'আলা হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করেছেন । কিন্তু এসব মুসলিম দাবীদার শাসকগোষ্ঠী তা হালাল বা বৈধ ঘোষণা করেছে এবং জনগণকে তা মানতে বাধ্য করছে । এমনকি আল্লাহ তা'আলা যে জিনা হারাম/অবৈধ ঘোষণা করেছেন এরা জিনাকারী-জিনাকারিনীর সম্মতিতে এই জিনাতো হালাল ঘোষণা করেছেই উপরন্তু জিনার ব্যবসা (পতিতালয়) পর্যন্ত হালাল/বৈধ ঘোষণা করেছে !

অন্যদিকে হুদুদ, কিসাস, শাতিমে রাসূল (সাঃ) বা রাসূল (সাঃ) এর অবমাননাকারীর শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদন্ডের বিধান, বালেগ হওয়া সংক্রান্ত শরয়ী বিধান, একাধিক বিবাহ ইত্যাদি বিষয় যা আল্লাহ তাআলা হালাল/বৈধ করেছেন এসব রাষ্ট্রের মুসলিম দাবীদার শাসকগোষ্ঠী তা হারাম/অবৈধ ঘোষণা করেছে ।
আল্লাহ তা'আলা এই ধরেনের শাসকগোষ্ঠীকে তাগুত বলে অভিহিত করেছেন । পাঠকের সুবিধার্থে এখানে সংক্ষেপে তাগুত সম্পর্কে একটু আলোচনা পেশ করছি ।

তাগুতঃ তাগুত আরবী শব্দ তুগইয়ান থেকে উৎসারিত । যার অর্থ সীমালঙ্ঘন করা । এমন প্রত্যেক ব্যাক্তি/শক্তিই তাগুত যে আল্লাহদ্রোহী হয়েছে এবং সীমালঙ্ঘন করেছে, আর আমাদের রব হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলার যে বৈশিষ্ট্য বা সিফাত বা ক্ষমতা বা কাজ রয়েছে তার কোন এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য বা সিফাত বা কাজ বা ক্ষমতাকে সে তার নিজের বৈশিষ্ট্য বা সিফাত বা কাজ বা ক্ষমতা হিসাবে দাবী করেছে এবং এভাবে নিজেকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে নিয়েছে । ইসলামী শরিয়াতের পরিভাষায় তাগুত বলা হয় ঐ সকল ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহর পরিবর্তে যার/যাদের আনুগত্য/ইবাদত করা হয় এবং সে/তারা এটা পছন্দ করে। মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, কেবল তাঁরই ইবাদাত করবে এবং তাঁরই আইন মেনে চলবে – এটিই আল্লাহর বিধান। কিন্তু এই মানুষই যখন আল্লাহর ইবাদত করার পরিবর্তে নিজেই ইবাদত নেওয়া শুরু করে এবং আল্লাহর আইন মানার পরিবর্তে নিজেই/নিজেরাই আইন দেয়া/প্রণয়ন করা শুরু করে অর্থাৎ আব্দিয়্যাত বা দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে নিজেই/নিজেরাই মাবুদ বা রবের আসনে বসে পড়ে তখনই তাকে/তাদেরকে তাগুত বলা হয়। আর ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা এভাবেই নিজেদের ধর্মীয় নেতা ও পীর-ফকিরদেরকে তাদের রব/ইলাহ/প্রভু বানিয়েছিল যা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন - তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে । (সূরা তাওবা-৩১)

ইমাম মালিক রহঃ বলেছেন এমন প্রত্যেকটি জিনিষই তাগুত আল্লাহ্ ব্যাতিত যার/যাদের ইবাদত করা হয় । আর আমরা ইতোমধ্যে কুরআন ও হাদীসের আলোকে এটা প্রমান করে দেখিয়েছি যে, কারো হুকুম/আদেশ/আইন/বিধান মানার নামই হচ্ছে ইবাদত।

সুতরাং যে বা যারা আল্লাহর পরিবর্তে হুকুম/আদেশ/বিধান/আইন/ইবাদত আবিস্কার বা প্রণয়ন বা বলবত করে তারাই হচ্ছে তাগুত। এক্ষেত্রে তাগুত দুই ধরনের হতে পারে।

১) আল্লাহর পরিবর্তে আমরা যার বা যাদের হুকুম/আদেশ/বিধান/আইন অনুগত হয়ে মান্য করি এবং তাতে তারা খুশী হয়/সন্তুষ্ট হয় যার বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা সূরা তাওবার ৩১ নাম্বার আয়াতে করেছেন এবং যার ব্যাখ্যা আমরা উপরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

২) এই প্রকার তাগুত হল রাষ্ট্রীয় বা সরকারী শক্তি। এরা আল্লাহর পরিবর্তে এদের হুকুম/আদেশ/বিধান/আইন মানতে এদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মাধ্যমে জনগণকে বাধ্য করে এবং আল্লাহর হুকুম/আদেশ/বিধান/আইন এর মোকাবেলায় এদের হুকুম/আদেশ/বিধান/আইন না মানলে জনগণকে শাস্তি প্রদান করে।

আর বলাই বাহুল্য যে এই উভয় প্রকার তাগুতকে অস্বীকার করাই হল " লা ইলাহা " র মূল কথা বা দাবী। লা ইলাহা মানে হচ্ছে কুফর বিত্তাগুত বা সকল প্রকার তাগুত বা নকল ইলাহকে অস্বীকার করা। মক্কার তৎকালীন কাফেররা আল্লাহতে বিশ্বাসী হলেও তাদের নকল ইলাহ তথা লাত, উজ্জা, মানাত বা তাদের বাপ-দাদাদের বানানো আইন-কানুনকে অস্বীকার করতে চায়নি বলেই তারা মুশরিক ছিল। এ প্রসঙ্গে মহান রাব্বুল আ'লামিন বলেন ,

" আর যারা তাগুতের উপাসনা পরিহার করে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয় তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ, অতএব আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দাও।" যুমার-১৭

" দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নাই। প্রকৃত শুদ্ধ এবং নির্ভুল কথাকে ভুল চিন্তা ধারা থেকে ছাটাই করে পৃথক করে রাখা হয়েছে। এখন যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারন করলো যা কখনই ছিঁড়ে যাবার নয় এবং আল্লাহ্ সব কিছু শ্রবন করেন এবং জানেন ।" বাকারাহ-২৫৬

" আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবী করে যে, যা আপনার উপরে নাজিল হয়েছে তারা সে বিষয়ের উপরে ঈমান এনেছে এবং আপনার পুর্বে যা অবতীর্ন হয়েছে তার প্রতিও ঈমান এনেছে কিন্তু তারা বিবাদপুর্ন বিষয়ে তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, অথচ তাদেরকে নির্দেশ করা হয়েছিলো যেন তারা তাগুতকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রস্ট করতে চায় ।" আন-নিসা ৬০

" যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ তাদের সাহায্যকারী ও সহায়। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন। আর যারা কুফুরীর পথ অবলম্বন করে তাদের সাহায্যকারী ও সহায় হচ্ছে তাগুত। সে তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এরা আগুনের অধিবাসী, সেখানে এরা চিরকাল থাকবে ।" সূরা বাকারাহ-২৫৭ ।

" যারা ঈমানদার তারা তো যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে আর যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে।" সূরা নিসা - ৭৬ ।

কাজেই দেখা যাচ্ছে তাগুত অস্বীকার (লা ইলাহা) ব্যতীত ঈমান বিল্লাহ গ্রহনযোগ্য নয়। না হলে আবু জাহেল ও তার সম্প্রদায় তো আল্লাহ তে বিশ্বাসীই ছিল যা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নিজেই বর্ণনা করেছেন –

বলুন পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার ? যদি তোমরা জান, তবে বল। এখন তারা বলবেঃ সবই আল্লাহর। বলুন, তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না - সুরা মুমিনুন:৮৪,৮৫

বলুনঃ সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে? এখন তারা বলবেঃ আল্লাহ। বলুন, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? -সুরা মুমিনুন: ৮৬,৮৭

বলুনঃ তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? এখন তারা বলবেঃ আল্লাহর। বলুনঃ তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে ? -সুরা মুমিনুন: ৮৮,৮৯

যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ, অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে -সুরা ঝুখরুফ: ৮৭

আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ।' -সুরা ঝুখরুফ:৯

যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে ? তবে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে?
-সুরা আনকাবুত: ১৬

যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে তার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে ? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না।' -সুরা আনকাবুত: ৬৩

কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা মুশরিক ছিল কারণ তারা তাগুতকে অস্বীকার করতে রাজী ছিল না।

আবার রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের মুরতাদ/তাগুত শাসকগোষ্ঠী ছাড়াও আরও অনেককে আমরা প্রভুর কাতারে শামিল করেছি এবং তা কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা ছাড়া একান্ত অনুগত হয়েই করেছি ।

এই কাতারে আছে বিভিন্ন **বেসরকারী আহবার ও রুহবান** । যেমন – দল/সংগঠন/নেতা-নেত্রী/প্রতিষ্ঠান(দেওবন্দ, নিজামুদ্দিন, মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি)/ তরিকা(চিশতীয়া, কাদেরিয়া, নকশেবন্দিয়া ইত্যাদি)/ফিরকা (আহলে হাদিস, সুন্নী জামাত ইত্যাদি) /দর্শন (মওদূদীবাদ ইত্যাদি) /স্কলার / আকাবির / পীর/ বুজুর্গ/ শাইখ ইত্যাদি ।

এক্ষেত্রে অল্প কিছু উদাহরণ আপনাদের জ্ঞাতার্থে আমি পেশ করছি –

যেমন ধরেন কুখ্যাত শাহবাগী নাস্তিক ব্লগার রাজিব হায়দারসহ অসংখ্য নাস্তিক আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী (সাঃ) এর শানে কটূক্তি করেছিল আর বাংলাদেশের আপামর তৌহিদী জনতা এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল । কিন্তু ইসলাম বিরোধী রাম-বাম পন্থী আওয়ামী লীগ নাস্তিকদের পক্ষ নেয় । আর এই দলের প্রধান নেত্রীর অনুসরণ করে এবং দলের প্রতি অনুগত হয়ে মুসলিম দাবীদার আওয়ামী লীগের অগনিত নেতাকর্মী শাতিমে রাসূল (সাঃ) বা রাসূল (সাঃ) এর গালিদাতাদের পক্ষ নিয়ে দেশের তৌহিদী জনতার উপর হামলে পড়ে যা এখনও অব্যাহত আছে । এরা কথায় কথায় মুসলমানদেরকে জঙ্গী, হেফাজত, মৌলবাদী, উগ্রবাদী ইত্যাদি বলে গালাগাল করে চলেছে । এখন সম্মানিত পাঠক আপনারাই বলুন তো মুসলমান কি রাসূল (সাঃ) এর গালিদাতাদের

পক্ষ নিতে পারে ? বা রাসূল (সাঃ) এর গালিদাতাদের পক্ষাবলম্বনকারী কি মুসলিম হতে পারে ? বা কোন মুসলমান কি রাসূল (সাঃ) এর এই কুলাঙ্গার শাতিমদের হত্যাকারী মুজাহিদ ভাইদেরকে বা শাতিমদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী/প্রতিবাদকারী ভাইদেরকে জঙ্গী, মৌলবাদী, উগ্রবাদী ইত্যাদি বলে গালিগালাজ করতে পারে ?

আবার আমাদের মধ্যে অনেকেই কুরআন-হাদীস বাদ দিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে যেমন- দেওবন্দ, নিজামুদ্দিন, মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিকে তাদের করনীয়-বর্জনীয়ের মানদণ্ড বানিয়ে নিয়েছেন বা এসকল প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের অজান্তেই প্রভুর আসনে বসিয়ে ফেলেছেন । এক্ষেত্রে কুরআন হাদিসে যাই থাক না কেন তারা যে যে প্রতিষ্ঠানের অনুসারী সেই প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত মনে করেন । এখন তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম এই প্রতিষ্ঠানগলো হকের উপর আছে । কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলো যে সব দেশে অবস্থিত সেসব দেশের কাফের বা মুরতাদ সরকার যদি তাদেরকে হকের বিপরীত অবস্থান নিতে বাধ্য করে তাহলে অবস্থাটা কি হবে ? বা এই প্রতিষ্ঠানগলোর নিয়ন্ত্রন যদি আবুল ফজল বা ফ. মাসুদের মত কোন দরবারী বা দালাল বা উলামায়ে সূ এর হাতে চলে যায় তখন কি হবে ?

সাম্প্রতিককালে পথভ্রষ্ট মাওলানা সাদ সাহেব যে নিজামুদ্দীনের নিয়ন্ত্রন নিয়ে নিয়েছিলেন তখন অবস্থাটা কেমন হয়েছিল ? বা এখন কেমন আছে ? কুরআন-হাদিস বাদ দিয়ে এই নিজামুদ্দিন বা সাদ সাহেবকে অনুসরণ করে কত কত তাবলীগের ভাইয়েরা আজকে এই নিজামুদ্দিন বা সাদ সাহেবকে তাদের প্রভুর আসনে বসিয়েছেন ?

আবার মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ভাঙ্গিয়ে আহলে হাদিসের মাদখালী শায়েখরা কি পরিমান মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করছে ? মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন স্কলার কি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে সৌদি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করে বা করতে পারবে ?

উপরোক্ত দুই প্রতিষ্ঠানের হালাত কি দারুল উলূম দেওবন্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় ? হিন্দুত্ববাদী ভারত রাষ্ট্রে অবস্থান করে কাশ্মীরের মজলুম মুসলমানদের পক্ষে বা গো-রক্ষা আন্দোলনের নামে যত্রতত্র গণপিটুনিতে প্রতিনিয়ত শাহাদাতবরনকারী মজলুম মুসলমানদের পক্ষে কুরআন হাদিস থেকে সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোন সত্য ফতোয়া দেওয়ার ক্ষমতা কি দারুল উলূম দেওবন্দ এর আছে ? এতো গেল সরকারী চাপ ! আর যদি আবুল ফজলদের হাতে দেওবন্দের নিয়ন্ত্রন চলে যায় তখন কি হবে ?

আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য এটা নয় যে আপনারা কেউ এই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে দূরে সরে যাবেন । বরং আমার বক্তব্যের মূল কথা হল কুরআন হাদিস বাদ দিয়ে বা কুরআন হাদিসের মোকাবেলায় এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্ধভাবে অনুসরণ করবেন না । করলে এই প্রতিষ্ঠানগুলো আপনার প্রভুর আসনে বসে যেতে পারে । কারণ কুরআন হাদিস কোন দিন কেউ পরিবর্তন করতে পারবেনা । কিন্তু এসকল প্রতিষ্ঠানের অবস্থান বা সিদ্ধান্ত যে কোন চাপেই পরিবর্তিত হতে পারে । হোক সেটা কুফফার বা মুরতাদ সরকেরর নিয়ন্ত্রন বা চাপে বা আবুল ফজলদের দালালীর কারণে ।

আবার আমাদের মধ্যে অনেকেই কুরআন-হাদীস এর মোকাবেলায় বিভিন্ন তরিকা এবং পীর সাহেবদেরকে অনুসরণ করেন । অথচ আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার সকল হুকুম/আদেশ/আইন/বিধান পরিপালন/বাস্তবায়ন/আমল করার একমাত্র তরিকা/পন্থা/পদ্ধতি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর তরিকা । তাহলে যারা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর তরিকা বাদ দিয়ে চিশতীয়া, কাদেরিয়া, নকশেবন্দিয়া ইত্যাদি তরিকা অনুসরণ করেন তাদের অবস্থা কি হবে ? অন্যদিকে আমাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভাই বোনেরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নির্দেশিত ইবাদত এর পরিবর্তে বিভিন্ন পীর সাহেবদের শিখানো ইবাদত করে থাকেন (যেমন ১২ তসবিহ ইত্যাদি যা সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমানিত নয়) তাদের অবস্থাই বা কি হবে ? তারা আসলে কার ইবাদত করছেন ? কারণ আল্লাহ তা'আলা তো দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন আর তাঁর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ও সেই দ্বীন পূর্ণ বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন । এখন যে বা যারাই দ্বীনের মধ্যে নতুন করে কোন কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করবে সে হবে মূলত রব বা ইলাহ বা প্রভু দাবীদার । কারণ দ্বীনের মধ্যে নতুন করে তাদের সংযোজন বা বিয়োজন এটাই প্রমাণ করে যে আল্লাহ আর তাঁর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্বীন পরিপূর্ণ করতে পারেননি (নাউযুবিল্লাহ) তাই সংযোজন বা বিয়োজনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । হুজুর আকরাম (সাঃ) যে সকল আজকার বা তাসবিহ শিখিয়ে দিয়ে গেছেন সেগুলো যথেষ্ট নয় (নাউযুবিল্লাহ) এজন্য পীর সাহেব নতুন করে ১২ তাসবিহসহ বিভিন্ন তাসবিহ বা আজকার আবিস্কার করেছেন । এসব বিষয় শুধু পীর সাহেব বা বিভিন্ন তরিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বিভিন্ন ফিরকা যেমন - আহলে হাদিস, সুন্নী জামাত ইত্যাদি, বিভিন্ন আকাবীর, বুজুর্গ, স্কলার, শায়েখদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য । এসকল ফিরকা, আকাবীর, বুজুর্গ স্কলার ও শায়েখদের অন্ধ অনুসারীদের কাছে কুরআন-হাদীসের পরিবর্তে তাদের নিজ নিজ ফিরকা, আকাবীর, বুজুর্গ, স্কলার ও শায়েখরাই দ্বীনের মানদণ্ড । বিস্তারিত বলতে গেলে মওদূদীবাদ, সুফীবাদসহ আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যাবে । কিন্তু নিবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তা পরিহার করছি ।

আবার প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় আকাবীর, বুজুর্গ, স্কলার, পীর, আল্লাহর অলী বা শায়েখ নির্ধারনেও তারা শরীয়াতের ধার ধারেননা । ফলে তারা শুধুমাত্র বিগত বা চলতি শতাব্দীর কিছু সংখ্যক উলামাকেই আকাবীর, বুজুর্গ, স্কলার, পীর, আল্লার অলী বা শায়েখ হিসাবে অনুসরণ করে চলেছেন । **যদিও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর চেয়ে বড় কোন আকাবীর নেই বা আলেম, বুজুর্গ, স্কলার বা শায়েখ বা আল্লাহর অলী বা পীর নেই এবং কে হাক্কানী পীর বা আল্লাহর অলী বা আকাবীর বা বুজুর্গ বা স্কলার বা শায়েখ আর কে ভণ্ড তা নির্ধারণের মাপকাঠি হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)** । কারণ প্রিয় নবী (সাঃ) বলে গিয়েছেন -আমার উম্মাত ঐ সব অবস্থার সম্মুখীন হবে, যা বনী-ইসরাঈল সম্মুখীন হয়েছিলো, ঠিক এক জোড়া জুতার একটি-অপরটির মতো । এমনভাবে যে, যদি তাদের কেউ নিজের মায়ের সাথে জ্বিনা করে থাকে, তবে আমার উম্মাতের মধ্যেও লোক থাকবে, যে নিজের মায়ের সাথে জ্বিনা করে । আর বনী ইসরাঈল ৭২ (বাহাত্তরটি)ভাগে ভাগ হয়েছিলো, আমার উম্মাত ৭৩ (তিয়াত্তর) ভাগে ভাগ হবে । **তাদের প্রত্যেকে জাহান্নামী হবে, শুধুমাত্র ১ (এক) টি ভাগ (মিল্লাত) ছাড়া ।" সাহাবীগণ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, "তারা কারা, হে আল্লাহর রাসুল ?" তিনি (সাঃ) বললেন, "যারা আমি যে পথে আছি এবং আমার সাহাবাগণ যে পথে আছে (সে পথ অনুসরণ করবে)।"** (সুনান তিরমিযী-২৬৪১)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সাহাবায়ে কেরামই (রাঃ) হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক একমাত্র সনদ প্রাপ্ত আকাবীর/আলেম/বুজুর্গ/স্কলার/শায়েখ/আল্লাহর অলী/পীর ।

ফলে যেসকল আকাবীর/আলেম/বুজুর্গ/স্কলার/শায়েখ/আল্লাহরঅলী/পীর এর সিরাত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সাথে মিলবে তারাই হবেন হাক্কানী বা অনুসরনীয় আর বাকীরা হবেন সূ বা ভন্ড । এখান থেকে আরও একটি বিষয় আমাদের সামনে পরিস্কার হয় আর তা হচ্ছে আমাদের আকাবীর মাত্র গুটি কয়েকজন নন । বরং অনেক । যেমন **শুরুতেই সোয়া লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ সাহাবায়ে কেরামই (রাঃ) আমাদের সনদ প্রাপ্ত আকাবীর,** তারপর রয়েছেন খাইরুল কুরুনের আকাবীরগনসহ সলফে সালেহীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ লক্ষ লক্ষ আকাবীরিন । কিন্তু অত্যন্ত উদ্দেশ্যমূলকভাবে শুধুমাত্র বিগত বা চলতি শতাব্দীর কিছু সংখ্যক উলামাকেই আমাদের সামনে আকাবীর হিসাবে দেখানো হচ্ছে । ফলে আমরা মূল থেকে ছিটকে পড়ে বিভিন্ন বিকৃতি ও বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ির মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি । একটা কথা খুব ভালভাবে মনে রাখতে হবে – শরীয়তের দলিল (কুরআন-হাদীস) ও সত্যের মাপকাঠি [সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)] **প্রথম যুগে বা শুরুর দিকে এই আখেরী যামানা বা শেষ দিকে নয়** । কোন জিনিষ মূল থেকে যত দূরে থাকে বিকৃতির সম্ভাবনা তত বেশী থাকে । আর মূল যেহেতু প্রথম যুগ বা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর যুগ তাই এই শেষ যুগে বিকৃতির সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী হবে এটাই স্বাভাবিক । কাজেই সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যেসকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন সেসকল বিষয়ে কেউ নতুন করে সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা রাখেনা চাই তিনি/তারা যত বড় মাওলানা বা স্কলার বা শায়েখ বা পীর বা আল্লাহর অলী বা আকাবীর বা মুফতি বা শাইখুল হাদীস বা আল্লামাই বা যেই হোন না কেন ।

যাইহোক সচেতন পাঠক মাত্রই এসব বিষয় অবগত আছেন যে কুরআন-হাদীসের পরিবর্তে কিভাবে মানুষ ফিরকাবাজীতে লিপ্ত আছে, কুরআন-হাদীসের পরিবর্তে কিভাবে মানুষ বিভিন্ন স্কলার / আকাবির / বুজুর্গ/ শাইখদের অন্ধ অনুসরণ করছে । স্কলার / আকাবির / বুজুর্গ/ শাইখ দিন বললে দিন রাত বললে রাত । চোখ মেলে কেউ দেখে না শাইখ রাতকে দিন বলছেন নাকি দিনকে দিন বলছেন । ঠিক নাসারারা যেভাবে পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছেল আমরাও যেন ঠিক সেভাবেই আমাদের সরকার/দল/সংগঠন/নেতা-নেত্রী/প্রতিষ্ঠান (দেওবন্দ, নিজামুদ্দিন, মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি)/ তরিকা (চিশতীয়া, কাদেরিয়া, নকশেবন্দিয়া ইত্যাদি)/ফিরকা (আহলে হাদিস, সুন্নী জামাত ইত্যাদি) /দর্শন (মওদূদীবাদ) / স্কলার / আকাবির / পীর/ বুজুর্গ/ শাইখ দেরকে ক্ষেত্র বিশেষ প্রভু বানিয়ে ফেলছি ।

এতক্ষনের এই আলোচনায় এটা আমাদের নিকট সুস্পষ্ট যে ঈমান গ্রহন করতে হলে বা মৃত্যু পর্যন্ত ঈমান ধরে রাখতে হলে যে কালিমার সাক্ষ্য দিতে হয় এবং তার উপর অটল অবিচল থাকতে হয় অর্থাৎ " লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ " – এই সাক্ষ্য বুঝে শুনে দিতে হবে। এই কালিমার মতলব না বুঝে কেবল মুখে মুখে সাক্ষ্য দিলে কোন লাভ হবে না। সত্যিকার অর্থে এই কালিমার গ্রহনযোগ্য সাক্ষ্য দিতে হলে অবশ্যই ইলাহ, ইবাদত আর তাগুত এর হাকিকত জানতে হবে এবং সকল নকল ইলাহ আর তাগুতকে অস্বীকার করতে হবে এবং তাদের সকল প্রকার আনুগত্য/ইবাদত পরিহার করতে হবে। তারপরই কেবল আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান গ্রহনযোগ্য হবে । তার আগে নয়। আর সৃষ্টির শুরু থেকে সকল নবী-রাসূলগনই মানব ও জীন জাতিকে এই বিশুদ্ধ তাওহীদের দাওয়াতই দিয়ে গেছেন। আর এই বিশুদ্ধ তাওহীদের তথা **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর** দাওয়াত দেওয়ার

কারনেই **সমস্ত নবী-রাসূলগণ কাফের-মুশরিক দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন** । কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের বিষয় হালে আমরা এই পবিত্র কালিমার অর্থই পাল্টে ফেলছি । যেমন ধরেন দাওয়াতে তাবলীগের ময়দানে আমরা কালিমার ব্যাখ্যা দেই এভাবে – **" আমরা দুচোখে যা দেখি বা না দেখি সব মাখলুক। মাখলুক কিছুই করতে পারে না আল্লাহ ছাড়া। কিন্তু আল্লাহ সব কিছু করতে পারেন মাখলুক ছাড়া ।"** এখন বলুনতো ভাই এই বক্তব্যের সাথে কালিমার ব্যাখ্যার কোন সম্পর্ক আছে ? এখানে কি ইলাহ বা ইবাদত বা তাগুত সম্পর্কে কোন কথা আছে ? এখন আপনি বলতে পারে এই বক্তব্যটি তো মিথ্যা না । হ্যাঁ আমিও বলছি এই বক্তব্যটি তো মিথ্যা না কিন্তু এই বক্তব্যটি কালিমা **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর** ব্যাখ্যাও না । এটি হচ্ছে খালেক ও মাখলুকের সিফাত। কারো নির্বুদ্ধিতার কারণেই হোক বা কারো সুচতুর কৌশলের কারণেই হোক এই বক্তব্যটি আজকে আমাদের সমাজে কালিমার ব্যাখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । এ যেন ক্যান্সার রোগে ডায়রিয়ার চিকিৎসা দেয়ার মত অবস্থা ! চিকিৎসাতো দেয়া হচ্ছেই । তবে তা যে রোগ হয়েছে তার নয় অন্য রোগের !

শুধুমাত্র লা ইলাহা তে বিশ্বাসী	=	নাস্তিক
লা ইলাহা র স্বীকৃতি ছাড়া আল্লাহ তে বিশ্বাসী	=	মুশরিক
লা ইলাহা ঘোষণা করে আল্লাহ তে বিশ্বাসী	=	মুমিন

লা ইলাহা	**ইল্লাল্লাহ**
কুফর বিত্তাগুত	**ঈমান বিল্লাহ**

মহান রাব্বুল আ'লামিন আমাদেরকে ঈমান বিধ্বংসী সকল কর্মকাণ্ড ও চিন্তা চেতনা থেকে হেফাযত করুন। আমিন।